

বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষা কমিশন গঠনের আবশ্যিকতা

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

০৬ জানুয়ারি, ২০২৫
০০:০০

শেয়ার

অ +

অ -



১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন করি। আমাদের এই মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ জীবন দান করে এবং সম্ভ্রম হারান দুই লাখ মা-বোন। পৃথিবীর ইতিহাসে বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা এক অত্যন্ত উজ্জ্বল ও ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। মানবেতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে।

১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষ পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে। তবে গভীর দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ করি, স্বাধীনতার মূল যে চেতনা, তা কোনোভাবেই প্রতিফলিত হয়নি স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারের কার্যক্রমের মধ্যে। যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ ও স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করেছিল, তাদের সেই স্বপ্ন স্বাধীনতার পরপরই হারিয়ে যায়। ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর স্বল্পকালের জন্য হলেও একটি আশার আলো দেখা গিয়েছিল, কিন্তু অচিরেই সে আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায় এরশাদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে।

পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক ধারার একটি সূচনা ঘটলেও তা বেশিদিন অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। এভাবে পর্যায়ক্রমে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে যতটুকু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল, তা ২০০৯ সালের পর থেকে

ক্রমেই হারিয়ে যেতে থাকে। গত ১৫ বছরে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকার দেশের গণতান্ত্রিক ধারার সব ধরনের অবলম্বন, প্রথা এবং প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে ফেলে।

আওয়ামী ফ্যাসিবাদের এই নির্মম অপশাসনের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ছাত্র-জনতার এক মহান গণ-অভ্যুত্থান সূচিত হয়।

এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পতন ঘটে ১৫ বছরের আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের। জনগণের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান। ছাত্র-জনতার এই ঐতিহাসিক গণসংগ্রামে ছাত্র-জনতার পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

অত্যন্ত আনন্দের কথা যে গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সরকার ক্ষমতাগ্রহণের পরপরই বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারা বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করেছে জাতীয় ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করার জন্য।

রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো; যথা—অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য কমিশন গঠন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, অনেক কমিশন গঠিত হলেও শিক্ষা কমিশন রূপে কোনো কমিশন গঠন করা হয়নি। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে শিক্ষার সংস্কার একটি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কর্তব্য। কেননা শিক্ষাই হচ্ছে একটি জাতির মেরুদণ্ড এবং বাংলাদেশে শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কোনোভাবেই অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা যায় না।



চক্ৰিশের গণ-অভ্যুত্থানের একটি মূল চেতনা এবং প্রধান কর্তব্য হচ্ছে জাতিকে একটি আদর্শগত শিক্ষার পরিবেশে পুনরায় ফিরিয়ে আনা। এই প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি, শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন হচ্ছে শুধু সময়ের দাবি নয়, এটি জাতীয় প্রয়োজন; যার কোনো বিকল্প হতে পারে না। আমরা সবাই জানি, দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গত দেড় দশকে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠার বদলে দলীয় রাজনীতির আড্ডাখানা হিসেবে গড়ে উঠেছে। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে

শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে দলীয় আনুগত্য বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এটি করা হয়েছে শিক্ষার সব স্তরে। এমনকি বিস্ময়কর হলেও সত্য যে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রেও আওয়ামী দলবাজির নিকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে। এর অনিবার্য ফল দাঁড়িয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে এক অসহনীয় সর্বনাশা অবনতি। এই অবনতি এমন স্তরে নেমে গেছে যে বাংলাদেশে আদৌ কোনো সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা আছে কি না, তা এক গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। কেবল শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও প্রকরণ নষ্ট করেই ফ্যাসিবাদ ক্ষান্ত হয়নি, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও দলবাজির নিকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডিতে আওয়ামী দলবাজির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে; এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও নগ্ন দলীয়করণের উদাহরণ দেখা যায়।

আধুনিক বিশ্বে উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। উচ্চশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্ঞানের জগতে বহু নতুন জ্ঞানের সংযোজন হয়েছে; সমৃদ্ধ হয়েছে বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডার। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ, উঁচু মান এবং অধুনা সৃষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারি না। এ

যুগ বিশ্বায়নের যুগ। সমগ্র বিশ্বকে একটি বৃহৎ পল্লীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অতএব এই বৃহৎ পল্লীর এক অঞ্চলের উন্নয়নের প্রভাব অন্য অঞ্চলে পড়তে বাধ্য। তা ছাড়া জ্ঞানের জগতে কোনো সীমারেখা নেই। আমাদের দেশে সীমিত আকারে উচ্চশিক্ষার প্রচলন বহুকাল আগেই শুরু হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হয়। তার পর থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে পৃথিবীর এ অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে।

তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় হাতে গোনা কয়েকটি কলেজ ছিল, যেখানে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হতো। এই সীমিত সুযোগ গ্রহণ করেছিল এই অঞ্চলের এক উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমান ছিল পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর। এর কারণ ছিল ঐতিহাসিকভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাদের অনীহা এবং উচ্চশিক্ষার অত্যন্ত সীমিত সুযোগ। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গভঙ্গের কারণে এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে নতুন আশা-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে প্রভাবশালী হিন্দুদের বাধার মুখে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। এতে এ অঞ্চলের মুসলিম নেতাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা উপলব্ধি করেন যে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ হলো উচ্চশিক্ষার অভাব। তাই উচ্চশিক্ষার প্রসারকল্পে তাঁরা ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেন। স্যার নওয়াব সলিমুল্লাহ, নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, এ কে ফজলুল হক প্রমুখ নেতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। এই পটভূমিতে ১৯২১ সালে ঢাকা শহরের রমনার মনোরম পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সেই বছরের জুলাই মাস থেকে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে এ দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়।

এরই মধ্যে দেশে আরো অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্ব পর্যন্ত এ দেশের শিক্ষার মান ছিল সন্তোষজনক। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষার এই মান আমরা ধরে রাখতে পারিনি; পারিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার পর ইংরেজিসহ বাংলা ভাষাকেও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এ কথা সত্য যে সদ্যঃস্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদান করা ছিল তখনকার সময়ের দাবি। কিন্তু এর একটি নেতিবাচক প্রভাবও জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে লক্ষ করা গিয়েছিল। স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে শিক্ষার মান ক্রমেই অবনতিশীল হয়। নানা কারণে পাঁচ দশক ধরে দেশের সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান নিম্নমুখী। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক—সব স্তরে শিক্ষার মানের অবনতি হয়েছে, যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই উচ্চশিক্ষার স্তরেও।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক আমি শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্য এবং একটি আদর্শগত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সামনে রেখে একটি শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের প্রস্তাব করছি। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, এ দেশের একজন প্রবীণ শিক্ষক হিসেবে আমি দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল যে একটি শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করা এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি কাজ। আমি প্রস্তাবিত শিক্ষা কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উল্লেখ করছি।

কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তরে সংঘটিত সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির তদন্ত করবে।

প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত নিয়োগ, পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে অনিয়ম, দলীয়করণ এবং সীমাহীন দুর্নীতি, উৎকাচ গ্রহণ ইত্যাদি ঘটেছে—তার পুঞ্জানুপুঞ্জ তদন্ত করবে।

শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্তর্হীন আর্থিক অনিয়মের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। কোন ক্ষেত্রে অর্থ আত্মসাৎ, পুকুরচুরি, প্রকল্পের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ চুরি ইত্যাদির তদন্ত করতে হবে।

কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পাঠদানে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

আমি মনে করি, তরুণ শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান গ্রহণ করবে না।

কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি তদন্তপূর্বক জাতির সামনে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে। এরই মধ্যে আর্থিক খাতের অনিয়ম ইত্যাদি নিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের বর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নীতিমালা মারাত্মকভাবে ভুলুর্গিত হয়েছে। কেবল দলীয় স্বার্থে অধ্যাদেশকে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি কোনো একজন উপাচার্য সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদে আসীন থেকেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, তিয়ান্তরের অধ্যাদেশের কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। এটিকে যুগোপযোগী করে তোলা আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার নৈতিক কর্তব্য। এই প্রক্রিয়ায় অবশ্যই শিক্ষক এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ আমাদের জ্ঞানজগতে বিরাট পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করার জন্য আমি মনে করি, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়ও কয়েকটি গুণগত পরিবর্তন ও সংযোজন প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আমি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপন করছি।

১. উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে আমাদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই ইংরেজি শিক্ষা চালু করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে তৃতীয় শ্রেণি থেকে শিক্ষার্থীরা বিদেশি ভাষা শিখতে (গ্রহণ করতে) পারে। তাই আমি মনে করি, প্রাথমিক শিক্ষার এই পর্যায়ে থেকে ইংরেজি শিক্ষা প্রদান শুরু করলে এবং মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি ভাষার পঠন-পাঠন ও চর্চা অব্যাহত রাখলে (বৃদ্ধি পেলে) ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজি ভাষাজ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে। অতএব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক গ্রন্থ থেকে জ্ঞান আহরণ সহজতর হবে। পাশাপাশি আমাদের ইংরেজি পাঠ্যবই ও সহায়ক গ্রন্থের অনুবাদ এবং বাংলা ভাষায় বই রচনার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

২. উচ্চশিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত রাখতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে হবে। ছাত্রদের রাজনীতি করার অধিকার আছে, কিন্তু শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসী রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে তারা হীন রাজনৈতিক স্বার্থে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার করবে না। যখন-তখন রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোকে অচল করে দেওয়া হবে না।

৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারলে সেশনজট দূর হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে তথা জাতীয় স্বার্থে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে সেশনজট দূর করতে হবে।

৪. ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাই হবে একমাত্র মাপকাঠি। ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-নির্বিশেষে মেধাই হবে উচ্চশিক্ষা লাভের মূল শর্ত। কোটা সিস্টেম বা অন্য কোনো কারণে যোগ্যতা শিথিল করা যাবে না।

৫. শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও যোগ্যতাই হবে একমাত্র মাপকাঠি। শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাদের একাডেমিক অর্জন, গবেষণাকর্ম, নিরলস চর্চা ও একাগ্রতার মূল্যায়ন করতে হবে। এর সঙ্গে উচ্চশিক্ষার মান প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। শিক্ষকতার মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের অবশ্যই গবেষণাকর্মে যুক্ত থাকতে হবে। শিক্ষকের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অবশ্যই নিয়মিতভাবে গবেষণাকাজে লিপ্ত থাকতে হবে। কারণ গবেষণা ছাড়া নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়।

৬. শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতনকাঠামো (Pay scale) প্রণয়ন করতে হবে।

৭. আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে হবে। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরিগুলোকে যুগোপযোগী, আধুনিক ও সমৃদ্ধ করতে হবে।

৮. বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পাঠ্যসূচি (শিক্ষাক্রম) হবে আধুনিক, আন্তর্জাতিক ও সমকালীন। একদিকে যেমন দেশের ও জাতীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা দরকার; অন্যদিকে আধুনিক, আন্তর্জাতিক বিশ্বজনীন পাঠ্যসূচি বা শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সংগতি রেখে সিলেবাস তৈরি করতে হবে। শিক্ষাক্রম এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যেন শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান মানুষ ও সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়। মোটকথা, শিক্ষা হতে হবে কর্মমুখী ও গণমুখী।

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য

এবং সাবেক রাষ্ট্রদূত

